আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল...

অরিন্দম নাথ

১৯৯২ সাল । এপ্রিল কিংবা মে মাস । আমি তখন প্রশিক্ষণার্থী ডি এস পি । মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে আছি । বি এস এফের একটি ট্রেনিং সেন্টার আছে । সি এস ডাব্লু টি । সেখানে তিন মাসের ট্রেনিং করছি । সত্যিকার অর্থেই তিন মাস । মার্চের মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত । তখন ইন্দোরে প্রচণ্ড গরম । আমার বন্ধু কেরি মারাক - তো জন্ডিসেই আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল ।

স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে:-

এরই মধ্য উজ্জয়িনীতে শুরু হলো কুম্ভমেলা । ইন্দোর এবং উজ্জয়িনী খুব কাছাকাছি । তাই সুযোগ হাতছাড়া করলাম না । এক রবিবারে কুম্ভমেলায় গেলাম । সাথে দু `একজন বন্ধু । সহকর্মী । আরো একটি কারণ ছিলো । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন' কবিতা । 'দূরে বহুদূরে, স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে , খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে ...।' উজ্জয়িনী ভারতের মধ্য প্রদেশ রাজ্যের একটি জেলা শহর । ভারতের একটি প্রাচীন নগরী । খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত এই শহর । দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী । শক ও গুপ্তযুগে এই নগরী জ্যোতিষ চর্চার কেন্দ্র ছিল । উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরেও গেলাম । মনে মনে কবির চিত্রিত ছবিরও চিন্তা করলাম । কবির সাথে তাঁর মালবিকা র দেখা হয়েছিলো সন্ধ্যে বেলায় । হয়তো খানিকটা নির্জনতায় । আর আমরা যখন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন ভর দুপুর বেলা । লাখো পূণ্যার্থীর ভিড় । সবাই শিপ্রা নদীতে অবগাহনে ব্যস্ত । সাথে মাইকে উৎকর্ণ আওয়াজ । বাতাসে লূ-র আবহ । সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা নামার আগেই সেদিন ইন্দোরে ফিরে এসেছিলাম ।

সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে :-

তারপর অনেক বছর চলে গেছে । আর পাঁচজন মোটামুটি শিক্ষিত বাঙ্গালী ছেলের মতোই আমাকে আরেকটি কবিতা নাড়া দেয় । জীবনানন্দের 'বনলতা সেন ' । রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' এবং জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কবিতার মধ্যে ভীষণ রকম সাদৃশ্য । দুটোই মৌলিক রচনা । রবীন্দ্রনাথের 'মালবিকা' উজ্জয়িনী নগরের বাসিন্দা । জীবনানন্দের 'বনলতা' নাটোরের । নাটোর বর্তমান বাংলাদেশের একটি জনপদ । জীবনানন্দের জন্ম বাংলাদেশেরই বরিশাল শহরে । জন্মসূত্রে তাঁদের পরিবার হিন্দু । পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন । তাঁদের পরিবার বরিশালে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের পথিকৃৎ । রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্ম । এই খানেই হয়তো দুই কবির সমাপতন ।

যে নাবিক হারায়েছে দিশা:-

আমি কিছু কল্পনা জোড়তে চাই । কল্পনার সূত্র আমার সাম্প্রতিক লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণ । আরব সাগরের বুকে অবস্থিত লাক্ষাদ্বীপ । ভারতের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল । মালায়ালম ও সংস্কৃতে লাক্ষাদ্বীপের অর্থ হল "লক্ষ্য দ্বীপ" । মতান্তরে, প্রাচীন ও মধ্য যুগের কিছু নাবিকের সাথে প্রথম পরিচয় হয়েছিল এই দ্বীপপুঞ্জের । সঠিক দ্বীপের সংখ্যা তারা জানতো না । ফলে লোকমুখে দাঁড়িয়েছিল ল ক্ষাধিক । সেই থেকে অপভ্রংশ হয়ে লাক্ষাদ্বীপ । সমগ্র লাক্ষাদ্বীপ ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি । একে অপরের কাছাকাছিতে অবস্থিত । কেরালা উপকূলের থেকে কাছে পড়ে । কেরালা উচ্চ -আদালতের আওতাধীন অঞ্চল । লাক্ষাদ্বীপের রাজধানী কাভারত্তি । এখানকার লোকেরা মালায়ালম , হিন্দি, মাহী এবং তামিল ভাষায় কথা বলে । কেরালার শেষ চেরা রাজা চেরামান পেরুমলের সাথে লাক্ষাদ্বীপের ইতিহাস জড়িয়ে আছে । আরব বণিকদের নির্দেশে তিনি ইসলাম ধর্মে রূপান্তরিত হন । তাঁর রাজধানী ক্রাগানোর ছেড়ে দেন । ক্রাগানোর বর্তমানে মক্কার কোদূঙ্গালোর নামে পরিচিত । রাজার খোঁজে অনেক অনুসন্ধান চলে । জাহাজে করে বিভিন্ন দলকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হয় । একটি দল ভয়ঙ্কর ঝড়ের কবলে পড়ে । তাদের জাহাজটি ভেঙ্গে পড়ে । বাঙ্গারাম নামে একটি দ্বীপপুঞ্জের কাছে । ঝড়ের প্রভাব

কমলে দলটি আগাত্তি দ্বীপে পৌঁছায় । কিছু সৈন্য নিজস্ব স্থানে ফিরে আসে । কিছু সৈন্য আগাত্তিতে বসবাস করতে শুরু করে ।

লাক্ষাদ্বীপে ইসলাম ধর্মের প্রচার করেন সন্ত উবেদুল্লাহ । এই ইতিহাস সপ্তম শতাব্দীর । ইসলাম ধর্মের প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেন । এই দ্বীপপুঞ্জের কাছে এসে তাঁর জাহাজটি একবার ভেঙ্গে পড়ে । তিনি নিজেকে একটি দ্বী পে খুঁজে পান । আন্দ্রোত দ্বীপে । জনবসতিও দেখতে পান । এখানেই বিবাহ করেন । স্থানীয় মানুষদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করেন । আন্দ্রোতে তাঁর কবরটি এখনও রয়েছে । একটি পবিত্র স্থান । পর্তুগীজদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে লাক্ষাদ্বীপে লুঠতরাজ শুরু হয় । পর্তুগীজেরা কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে । কিন্তু তাদের কর্তৃত্ব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি । স্থানীয় মানুষেরা তাদেরকে বিষক্রিয়ার মাধ্যমে হত্যা করে । এরপর ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে লাক্ষাদ্বীপে চিরাক্কলের রাজার রাজত্ব স্থাপিত হয় । কিছু দিন পর কিছু দ্বীপপুঞ্জ টিপু সুলতানের শাসনে চলে আসে । ব্রি টিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৯৯ সালে এখানে আবির্ভূত হয় । পরবর্তীতে, ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র লাক্ষাদ্বীপ ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে আসে । স্বাধীনতার পর , এই দ্বীপপুঞ্জ-গুলি ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অধীনে এসে যায় । ১৯৫৬ সালে লাক্ষাদ্বীপ একটি পৃথক কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল রূপে গড়ে ওঠে । লাক্ষাদ্বীপ ৩৬-টি দ্বীপপুঞ্জের সমষ্টি । মোট আয়তন প্রায় ৩২ বর্গ কিলোমিটার । আরব সাগরের বুকে প্রায় ৩০,০০০ বর্গ মাইল এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এই দ্বীপগুলি । আন্দ্রোত , আমিনি, আগাত্তি, বিত্রা, চেট্টলাট, কাডমট, কালপেনি, কাভারত্তি, কিলত্তন এবং মিনিকয় এই দ্বীপগুলিতে লোকজন বাস করে । বাঙ্গারামেও গড়ে উঠেছে রিসোর্ট ।

জীবনের সমুদ্র সফেন:-

২০১৬-এর ডিসেম্বরের এল টি সি -র জন্য ছুটি নিলাম । কুড়ি দিনের ছুটি । ইচ্ছে জাহাজে কোচিন থেকে লাক্ষাদ্বীপে যাব । পাঁচ -ছয় দিন কাটাব । কিন্তু বিধি বাম । ডিসেম্বর মাস । বড়দিনের সময় । লাক্ষাদ্বীপে প্রবেশের জন্য প্রশাসনের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নিতে হয় । আগে থেকে জাহাজের সীট বুক না থাকাতে সেই অনুমতিও মিলছিল না । শেষে কেরল নিবাসী আমাদের আই জি শ্রীযুক্ত কে ভি শ্রীজেশকে ধরলাম । তিনি শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামের টেলিফোন নাম্বার দিলেন । আই পি এস অফিসার ।

লাক্ষাদ্বীপের একমাত্র আই আর ব্যাটেলিয়নের কমাণ্ড্যান্ট । বর্তমানে এস পি -র দায়িত্বে । তাঁর সাথে কথা বললাম । কিছুটা আশ্বাস মিললো । প্লেনের টিকিটের ভীষণ রাশ । ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই টিকিট কাটলাম । কোচিন থেকে আগাত্তির । ২৬ শে ডিসেম্বরের । ফেরার টিকিট থেকে ২৮ শে ডিসেম্বরের । আগাত্তি থেকে কোচিন । দিনে শুধু একটিই বিমান চলে । এয়ার ইন্ডিয়ার ছোট্ট বিমান । সাতাশ-আঠাশ জনের বসার আসন । আমরা তিনজন । আমার স্ত্রী পারমিতা । ছেলে নীল । আর আমি । শেষ পর্যন্ত অনুমতিপত্র মিলল । আগাত্তি ও বাঙ্গারাম ভ্রমণের । ঘনশ্যাম সাহেব থাকেন কাভারত্তিতে । তাঁর সাথে দেখা হবে না । সহকারী কমাণ্ড্যান্ট মোহম্মদ রফিক আমাদের রিসিভ করবেন । আগাত্তি বিমান-বন্দরে ।

কোচিন পৌঁছলাম ২১ শে ডিসেম্বর রাত্রিতে । প্রথমে দু `রাত্র কাটালাম আঙ্গমালিতে । কোচিন বিমান বন্দরের লাগোয়া 'Elite Palazzo' হোটেলে । সেখান থেকেই ট্যাক্সিতে কোচিন শহর পরিক্রমা সারলাম । চেরাই সমুদ্র সৈকতেও গেলাম । মধ্যে একরাত্র কাটালাম টেক্কাদিতে । পথে পড়ল আলেপ্পি । আসলে বছর সাতেক আগে একবার কেরালা ভ্রমণ করেছি । সেবার মুন্নার , আলেপ্পি, ত্রিবান্দম, কোভালম, প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘ সময় ছিলাম । এ `বার শুধু লাক্ষাদ্বীপ যাবার আগে সময় কাটানোর মানসিকতা । টেক্কাদিতে থেকে পেরিয়ার জাতীয় ব্যাঘ্র অভয়ারণ্যে যেতে হয় । কিন্তু এ `বছর খরা । জলাধার শুকিয়ে গেছে । পার্কে ঘুরলাম । স্থানটি ভালো লাগলো । বড়দিনের আগে পৌঁছলাম কোভালম । আমার সফেন সমুদ্র । বড়দিনের দি ন প্রচুর ভিড় হল । বিদেশীদের সংখ্যাও চোখে পড়ার মত । স্বল্প-বসনে রৌদ্রস্নান করে ত্বক ঝলসাতে ব্যস্ত । মাখন-বর্ণ ত্বক তাদের পছন্দ নয় । ভারতীয় শ্যামলিমার খোঁজে এখানে আসা । রাত্রি সোয়া ন`টার দিকে কোভালম ত্যাগ করলাম । লক্ষ সোজা কোচি বিমানবন্দর । যখন পৌঁছলাম, ঘড়িতে ভোর তিনটে ।

সবুজ ঘাসের দেশ:-

যথা সময়েই বিমান ছাড়ল । সকাল সোয়া দশটা নাগাদ । আমাদের সীট পড়েছে ২ নং সাড়িতে । পেছনের দরজা দিয়ে উঠতে হয় । ফলে অনেকটা পথ প্যাসেজের মধ্য দিয়ে

আমাদের হাটতে হলো । বিমানে প্রাতরাশও মিললো । আমরা সদ্ব্যবহার করলাম । আমাদের গন্তব্য আ গাত্তি । লাক্ষাদ্বীপের একমাত্র বিমানবন্দর । রাজধানী কাভারত্তিতে যেতে হয় জাহাজে কিংবা হেলিকপ্টারে । আমাদের বিমান সাদা মেঘের উপরে উঠে গিয়েছিল । ফলে নিচের সমুদ্র নজরে আসছিল না । কিন্তু সাড়ে এগারোটা নাগাদ যখন অবতরণ করতে শুরু করল তখন অন্য চিত্র । নীচে নীলচে -সবুজ আরবসাগর । সমুদ্রের স্নিগ্ধ চঞ্চল উচ্ছলতা যাত্রীদের মুগ্ধ করলো । আগাত্তি বিমান বন্দরটি প্রায় সমুদ্রের জলের লেভেলে । বড়জোর দু `তিন ফুটের ফারাক । চারিদিকটা সবুজ ঘাসের গালিচায় মোড়া । বিমান থেকে নামার পর একজনই তিনতারা অফিসার নজরে এলো । তাই সহকারী কমাণ্ড্যান্ট মোহম্মদ রফিককে সনাক্ত করতে অসুবিধা হলো না । আমাদের সাথে একই বিমানে জম্মু-কাশ্মীরের একজন মন্ত্রী এসেছেন । তিনি আমাদের দেখভালের ভার নায়েব-সুবেদার জাফরকে দিলেন । আরেকজন পুলিশ অফিসার ছিলেন । সি আই সাহেব । তাঁর এক হাতে প্লাস্টার । তিনিও মন্ত্রীর সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন । এরাইভ্যাল লাউঞ্জে আমাদের অনেকক্ষণ বসতে হলো । পারমিট এন্ট্রি করাতে যত না সময় লাগলো, মাল সংগ্রহ করতে ঘাম ছুটে গেলো । তখন আবিষ্কার হলো নীলের লাগেজ আসেনি । আগাত্তিতে এইটা নাকি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা । স্টেশন ইন-চার্য মিঃ ভট্ট আমাদের সাথে একই বিমানে এসেছেন । দু`বছর এখানে চাকুরী করবেন । তিনি ফোনে কোচিতে কথা বললেন । কনফার্ম করলেন ছেলের ব্যাগ কোচি বিমান বন্দরেই আছে । কথা দিলেন পরের দিনের বিমানে নীলের লাগেজ অবশ্যই আনিয়ে দেবেন । সরকারী অতিথিশালায় আমাদের স্থান হয় নি । সেখানে মন্ত্রী থাকবেন । আমরাও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলাম । আগাত্তি দ্বীপটি দেখতে ‘কমা’(,) আকৃতির । মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত অনুমানিক দৈর্ঘ্য সাত কিলোমিটার । মোটা অংশের দৈর্ঘ্য দেড় থেকে দুই কিলোমিটার । জাফর আমাদের নিয়ে গেলো একটি হোটেলে । কমার মাথার দিকে । সেদিকেই ড সি অফিস । ফ্যাডারেল ব্যাংক । পাবলিক লাইব্রেরী । বাজার, দোকানপাট । কংক্রিটের রাস্তা । আগাত্তিতে গাড়ির সংখ্যা পনের বিশটি । মোটর সাইকেল শ `তিনেক । বাই -সাইকেল প্রচুর । জিনিস চুরি হয় না । তবে পাল্টা-পালটি হয়ে যায় । টাটা-স্যুমো জাতীয় গাড়ি । মিনিট দশেকের মধ্য আমরা গন্তব্যে পৌঁছেগেলাম । বেলা প্রায় একটা । চারিদিকে শুধু নানা উচ্চতার , নানা বয়সের নারকেল গাছ । হোটেলটি দু`তলা দালান-বাড়ি । একপাশে ব্যাংক । দু`টি রুম এ

সি । একটি ডাবল -বেড এ সি রুম নিলাম । ভাড়া দৈনিক আটশো টাকা । আগাত্তির লোকেরা লোভী নয় ।

দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর:-

জাফর আমাদেরকে খাবার হোটেলে নিয়ে গেলো । থাকার হোটেল থেকে পায়ে -হাটা দূরত্বে । হোটেলের একটি বয়ের বাড়ি আসামের কামরূপে । বছর দু `য়েক হলো কেরল থেকে এখানে এসেছে । সাথেই পাবলিক লাইব্রেরী । একটি মিউজিয়াম । না , আগাত্তিতে আমরা দারুচিনি গাছ পাই নি । দারুচিনি গাছ পেয়েছিলাম টেক্কাদিতে । ভেষজ গাছপালার একটি পার্কে । আগাত্তিতে হোটেলের সামনেই একটি মাঝারি আকারের বটগাছ । তবে প্রচুর ঝুড়ি । জাফর থাকে আমাদের হোটেলের ঠিক পেছনে । লাক্ষাদ্বীপে পুরুষেরা শ্বশুড়বাড়িতে থাকে । এরপর আমরা একটু বিশ্রাম নিলাম । বিকেল পাঁচটায় জাফরসহ গাড়ি নিয়ে ঘুরতে বেরুলাম । প্রথমে আমরা গেলাম সা মুদ্রিক মাছের প্রজনন এবং গবেষণা কেন্দ্রে । সরকারী সংস্থা । খুবই বেহাল অবস্থা । আমাদের ত্রিপুরার মৎস্য দপ্তরের লোকেরা গর্ব করতে পারে । তারা নিঃসন্দেহে এই কেন্দ্রীয় সংস্থাটি থেকে এগিয়ে । এরপর আমরা গেলাম দ্বীপের পূর্ব -পাশের একটি জেটিতে । বিহারের একটি পরিবারের সাথে পরিচয় হলো । বাবা -মা ও মেয়ে । আমাদের সাথে একই বিমানে আগাত্তি এসেছেন । ভদ্রলোক স্টেইট ব্যাংকের অফিসার । ভূপালে পোস্টিং । বয়সে আমার চেয়ে কিছুটা ছোট । এরপর আমরা গেলাম লাগুন সমুদ্র সৈকতে ।

রাস্তায় অনেক পাকা বাড়ি নজরে এলো । আবার নারকেল পাতায় ছাওনি কুঁড়ে ঘরও নজরে এলো । তটভূমিটি সত্যি খুব সুন্দর । চারপাশে সাদা বালি । যেন সাদা লবণ । সমুদ্রের জল নীলাভ । কোথাও হালকা সবুজ । যেখানে জল গভীর , সেখানকার জলের রং কালো । এখানে সমুদ্রের উদ্দামতা নেই । শুধু বাতাসের দোলায় ছোট ছোট ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সমুদ্র সৈকতে । খুবই সংযত ভাবে । সূর্যাস্তের ছবি তোলার চেষ্টা করলাম । কিন্তু আকাশে হালকা মেঘ থাকায় সম্ভব হলো না । বীচের অদূরে জেলেরা ‘টোনা মাছ’ কাটছে । এগিয়ে গেলাম দেখতে । প্রচুর মাছ ধরা পড়েছে । দু`তিন জন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ধারালো চাকু দিয়ে মাছের পেট , মাথা এবং শরীর আলাদা করছে । মাছে র ডিমও

আলাদা করে রাখছে । একপাশে নেট -দিয়ে ঘেরা মাছ শুকানোর জায়গা । মাছের নাড়িভুঁড়ি গর্ত করে মাটিতে পুঁতে রাখছে । এমনি তিন -চারটি দল নজরে এলো । প্রতি দলে আট -দশজন জেলে ।

ছোট ছেলেদের একটি দল এসেছে শিক্ষামূলক ভ্রমণে । আশপাশের দ্বীপ থেকে । তারা বীচে ফুটবল খেলছিল । সমুদ্র সৈকতে কয়েকটি দোকান । চেয়ার টেবিল পাতা । আবার মিঃ ভট্টর সাথে দেখা হলো । তিনি আবারো আশ্বাস দিলেন , পরদিন নীলের লাগেজ আনিয়ে দেবেন । আমরা চা -স্ন্যাকস খেলাম । এরমধ্যে জাফরের কাছে ফোন এলো । সরকারী অতিথি-শালায় আমাদের জন্য একটি রুমের ব্যবস্থা হয়েছে । আমরা আমাদের বর্তমান হোটেলই পছন্দ করলাম । ফেরার পথে স্থানীয় দোকান থেকে নীলর জন্য কিছু পোশাক কিনলাম । এখানকার স্কুলের শিক্ষার মান ভালো । কেরল থেকে শিক্ষক -শিক্ষিকারা ডেপুটেশনে পড়াতে আসেন । মেয়েরাও সমানতালে পড়াশুনা করে ।

অতিদূর সমুদ্রের'পর:-

বাঙ্গারাম যাবার জেঠি আমাদের হোটেল থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্বে । জাফর আমাদের বলেছিলো সকাল আটটায় বোট ছাড়বে । কিন্তু পরদিন সকাল সাতটা থেকেই তাগাদা দিতে শুরু করলো । বললো , একটি স্পীড-বোট এখুনি ছাড়বে । আমরাও প্রায় তৈরি ছিলাম । সাড়ে সাতটায় পৌঁছে গেলাম জেটিতে । সি আই সাহেবও ছিলেন সেখানে । হাতে প্লাস্টার নিয়ে । বললেন , দুপুরের দিকে বাঙ্গারাম যাবেন । জম্মু -কাশ্মীরের অতিথিদের সাথে । আমাকে মিঃ ফারুক খানের ফোন নাম্বার দিলেন । মিঃ খান অবসরপ্রাপ্ত আই পি এস অফিসার । তাঁর একটি সংস্থা আছে। বাঙ্গারাম দ্বীপের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এবং দ্বীপকে ভিত্তি করে জ ল-ক্রীড়ার ব্যবস্থা করেন । স্পীড -বোটে পরিচয় হলো দিল্লীর এক স্কুলের প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সাথে । ঠিক যেন বিয়াঙ্কা কাস্তাফিয়র । মহিলার স্বামী এবং ছেলে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে । ম্যাডামের সবকিছুতেই উৎসাহ । এর আগে কাভারত্তি ঘুরে এসেছেন । সকালে বাই-সাইকেলে আগাত্তি দ্বীপ টহল দিয়েছেন । আমরা চারজনই যাত্রী । তিনজন নাবিক । নীল নির্জন । শুধু মোটর -বোটের আওয়াজ । মাঝিরা ডাবের জল খাওয়ালো । শেষে ডাবের শ্বাস । এক সময় আমাদের পাশ দিয়ে একটি বোট বেরিয়ে গেলো । ছাত্রদের এক্স -কারসনের দল । আমরা হাত নেড়ে শুভেচ্ছা

জানালাম । তাদের গন্তব্য মনে হলো অন্যত্র । ঘণ্টা -খনেকের মধ্য আমরা বাঙ্গারম পৌঁছেগেলাম ।

মিঃ ফারুক খান আমাদের জন্য জেঠীতেই দাঁড়িয়েছিলেন । বয়স হয়েছে । কিন্তু দেখতে তাঁকে ভীষণ ফিট লাগে । বাঙ্গারাম দ্বীপ আগাত্তি থেকেও ছোটো । আগাত্তির আকৃতির যদি হয়ে থাকে কমার মত , বাঙ্গারামের আকৃতি সেমি কোলনের(😉;) মত । সেমিকোলনের বিন্দীর মত আরেকটি ছোট দ্বীপ পরেলি । খুবই কাছে । জন-মানব হীন । পাখিদের দ্বীপ । পাখিরা সেখানে নির্ভাবনায় বাস করে । বাঙ্গারাম আগাত্তি থেকে সুন্দর । নারকেল ও অন্যান্য গাছের ছায়ায় অপেক্ষাকৃত সবুজ । জনবসতি কম বলে নির্জন । প্রকৃতি তার ডালি উজাড় করে দিয়েছে । সমুদ্রতটের বালুকা -বেলার কাছ ঘেঁসে কিছু পর্ণকুটির । সাথে সব আধুনিক সুবিধা । বিলাসবহুল থাকার ব্যবস্থা । টার্গেট বিদেশী এবং এন আর আই । আমরা বাফেটে প্রাতরাশ সারলাম ।

এবার জলক্রীড়ার পালা । চেরা রাজা চেরামান পেরুমলের খোঁজে বেরিয়েছিল একদল নাবিক । তাদের জাহাজ ডোবে গিয়েছিল বাঙ্গারাম দ্বীপের অদূরে । জল সেখানে অগভীর । জাহাজটিতে এখন মাছ এবং সামুদ্রিক প্রাণীর বাস । জাহাজের ধ্বংসাবশেষকে ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছে স্নরকেল ডাইভিং এর ব্যবস্থা । সাবমেরিনে টিউব অথবা চোঙের সাহায্যে শ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে । এরই অনুকরণে স্নরকেল ডাইভিং । সাথে স্নরকেল মাস্ক । মাছ পাখনা । মোটর বোটে করে যেতে হয় । তট থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্ব । সেখানেই অগভীর জলে ডোবে যাওয়া জাহাজের ধ্বংসাবশেষ । এবার আমাদের বোটে বিয়াঙ্কা কাস্তাফিয়র ছাড়াও আরো চারজন । নীলের বয়সী একটি ছেলে । তার বাবা ও মা । ব্যাঙ্গালুরু থেকে এসেছেন । আরেকজন মহিলা । এন আর আই । আমেরিকা প্রবাসী । মহিলার স্বামী এবং দুই ছেলে বাঙ্গারাম দ্বীপে সারাদিন জলে পড়ে থাকে । স্কুবা -ডাইভিং এর কোর্স করছে । তিন দিনের কোর্স । স্কুবা -ডাইভিং চার কেজি ওজনের অক্সিজেন সিলিন্ডার , স্কুবা মাস্ক, ডাইভিং মাস্ক, স্কুবা মাস্ক চাবুক , স্কুবা পাখনা, ডুব পাখনা, ডাইভিং পাখনা ইত্যাদি নিয়ে করতে হয় । আমাদের মত যারা আনাড়ি তাদের একটু ট্রেনিং দিয়ে তিন থেকে ছ`মিটার জলের গভীরে নিয়ে যাওয়া হয় ।

সাথে একজন সাহায্যকারী অভিজ্ঞ ডুবুরি । অন্য একজন ডুবুরি ছবি তো লে । স্কুবা ডাইভিং কোর্স করার পর সাহায্যকারী ছাড়াই একজন ডুবুরি সর্বোচ্চ আঠার মিটার অবধি জলের গভীরে ডোব দিতে পারে । গ্লাসবটম বোট । যেতে যেতে নীচের নীল জল নজরে আসছিল । ধ্বংসের মধ্যেই প্রাণ । জলেডোবা জাহাজেই রঙিন মাছেদের বাস । জলতলের রঙিন প্রবালদ্বীপ । আমাদের আশেপাশে নির্ভয়ে সামুদ্রিক জলজ প্রাণীরা ঘোরাফেরা করছে । প্রায় একঘণ্টা আমরা সেখানে কাটালাম । এরই মধ্যে বিয়াঙ্কা কাস্তাফিয়র কান্নাকাটি শুরু করলেন । তাঁর হাতে নাকি জেলিফিশ কামড়ে দিয়েছে । ভিনিগার লাগাতে হবে ।

ডাঙ্গায় নেমেই তিনি হম্বিতম্বি শুরু করলেন । মোটর বোটে ভিনিগার নাই কেন? কর্তৃপক্ষ ভিনিগারের ব্যবস্থা করলেন । শেষে আবিষ্কার হলো , ভদ্রমহিলার বাঙ্গারাম দ্বীপ ভ্রমণের অনুমতি তখনো মঞ্জুর হয় নি । সবাই ভেবেছিলো তিনি আমাদের গ্রুপের সদস্য । ইতিমধ্যে জম্মু-কাশ্মীরের মন্ত্রীও হেলিকপ্টরে এসে পৌঁছেছেন । সবাই তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো । সি আর পি এফের বাহিনীও নজরে এলো । আমরা এবার স্কুবা ডাইভিং করতে নামলাম । প্রথমে আমরা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নিলাম । তারপর জলে নামলাম । দেখা গেলো , সাঁতার না জানলে স্কুবা ডাইভিং সহজ হয় । স্কুবা ডাইভিং -এ মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয় । আবার মুখ দিয়েই শ্বাস ছাড়তে হয় । মুখে সাগরের নোনাজল ঢোকে গেলে অস্বস্থি লাগে । পারমিতার স্কুবা ডাইভিং সবচেয়ে ভালো হলো । আবার প্রত্যক্ষ করলাম জলচরদের অবাক জীবন । সমুদ্রের উপরের পৃথিবীর চেয়ে যেন নীচের পৃথিবী আরো সুন্দর । অনেকদিন আগে পড়া নটরাজনের একটি গল্প মনে এলো । গল্পটির নাম ভুলে গেছি । চোখের সামনে প্রতিভাত হলো প্রবালরাজ্য । অসম্ভব সুন্দর । রঙিন । ভাষায় বর্ণনা করা যায় না । হয়তো পান্নার মতো । হয়তো চুন্নির মতো । মার্বেলের মতো । কিংবা রক্তপ্রবালের মতো । সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে শতশত রঙিন মাছ । সিন্ধুঘোটক । নাম না জানা সামুদ্রিক প্রাণী । সবকিছু যেন স্বপ্নের মতো ।

নীল আরো কিছু ওয়াটার স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করলো । মধ্যাহ্ন ভোজনের তখনো কিছুটা দেরি ছিল । বালির ওপরে বিশ্রাম চৌকিতে আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম নিলাম । মনে এক

অদ্ভুত প্রশান্তি মিললো । দুপরের খাবার পর ভাটা শুরু হলো । অনেকে পায়ে হেঁটে দ্বীপ পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়লো । বলা -বাহুল্য বিয়াঙ্কা কাস্তাফিয়র সবার আগে । ব্যাংকের ভদ্রলোকও পরিবারসহ পরেলি দ্বীপ হয়ে বাঙ্গারামে পৌঁছেছেন । সেই দ্বীপে স্নরকেল ডাইভিং উপভোগ করেছেন । সমুদ্রবেলায় বসে আমরা তাঁদের সাথে গল্প করে কাটালাম । বিকাল চারটের কিছু পরে বোটে চাপলাম । ইচ্ছে ছিলো পরেলি দ্বীপে নামার । কিন্তু ভাটার কারণে নৌকা দ্বীপে ভিড়তে পারলো না । আমাদের বাঙ্গারাম দ্বীপের অন্য একটি পাশে নিয়ে গেল । ভাটার কারণে জল নেমে গেছে । দু `টি লোক সমুদ্রবেলায় এক ধরনের কেঁচো ধরছিলো । টোনা মাছের আধার । ধরার কায়দা অবিকল শিক দিয়ে কুঁচিয়া মাছ ধরার মতো । পথে আমাদে র একটি ডলফিন মনোরঞ্জন করলো । মোটর বোটে যাতায়তের ভাড়া পাঁজ হাজার টাকা । বিয়াঙ্কা কাস্তাফিয়র তাঁর শেয়ার আমাদেরকে মিটিয়ে দিলেন ।

হোটেলে এসে দেখলাম নীলের লাগেজ পৌঁছে গেছে । রাত্রিতে আগাত্তি কিছুটা ঘুরে দেখলাম । পরদিন সকালেও ঘুরে বেড়ালাম । লাগুন সৈকতে গেলাম । এখানকার লোকজনেরা দেখতে কিছুটা কালো । চেহারায় বেশ শার্পনেস আছে । মোটামুটি আকর্ষণীয় চেহারা । বিশেষ করে চোখগুলি সুন্দর । ছাগল , গরু এবং মুরগী প্রতিপালন করে । ছাগল -গরুকে কি খাওয়ায় , কিছুটা বিস্ময়ের । ফুল লতাপাতার বৈচিত্র্য কম । লোকেরা সচ্ছল । ইলেক্ট্রিসিটি আছে । ডিজেল জেনারেটরের বিদ্যুৎ । যথাসময়ে ফেরার বিমানে চাপলাম । মোহম্মদ রফিকের কাছে মিঃ ঘনশ্যামের জন্য আমার ‘I Adore’ বইয়ের একটি কপি দিলাম । একটি ক্যালেন্ডার উপহার পেয়েছিলাম । কাজে লাগলো । জাহিরকে দিলাম । সাথে তার দুই বাচ্চার জন্য চকোলেট ।

বিম্বিসার অশোকের ধুসর জগতে:-

এ`বার জীবনানন্দে ফিরে আসি । কবি তাঁর কবিতায় বিম্বিসার অশোকের ধুসর জগতের প্রসঙ্গ এনেছেন । পাশাপাশি সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে ভ্রমণের কথাও বলেছেন । সম্রাট অশোক পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শাসকদের একজন । দাসপ্রথা রোধ , মৃত্যুদন্ড রোধ, বনায়নের উপর গুরু ত্ব, নারীপুরুষের সমতার গুরুত্ব ইত্যাদি ছিল তাঁর কিছু

যুগান্তকারী প্রয়াস । তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ , পশ্চিমে ইরান ও আফগানিস্তান, উত্তরে পামীর থেকে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ -ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । সত্যিকার অর্থে তাঁর মনের পরিবর্তন আসে কলিঙ্গ যুদ্ধে র পর । খ্রিস্টপূর্ব ২৬১ দয়া নদীর ধারে ধৌলি পাহাড়ের কাছে এই যুদ্ধ হয় । ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ । যুদ্ধে ১,০০,০০০ কলিঙ্গসেনা এবং ১০,০০০ মৌর্যসেনা নিহত হয় । অসংখ্য নর -নারী আহত হয় । যুদ্ধের বীভৎসতা সম্রাট অশোককে বিষাদময় করে তোলে । তিনি যুদ্ধের পথ ত্যাগ করেন । বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন । অহিংসা -নীতি পত্তন করেন । দেশে -বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন । তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীলংকা পাঠান । কাশ্মীর , গান্ধার, কোংকন, মহারাষ্ট্র, নেপাল, থাইল্যান্ড, ব্রহ্মদেশ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও যায় । লাক্ষাদ্বীপ সেই যুগেও ছিলো ।

প্রশ্ন হলো জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় উপরের প্রসঙ্গ আনলেন কেন । ‘বনলতা সেন’ কি মানবী ছিলেন? ‘বনলতা’ ছাড়াও তিনি শ্যামলী , সুরঞ্জনা, সুচেতনা, সরোজনী, সুজাতা, অমিতা ইত্যাদি নারী চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন । কিন্তু অন্যদের নিয়ে এতো কথা হয় নি । অনেকেই বনলতা সেনকে রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবেই কল্পনা করেছেন । প্রখ্যাত গবেষক ডা. ভূমেন্দ গুহ উল্লেখ করেছেন, কবির জীবনে প্রেম এসেছিলো । সেই মেয়ের নাম শোভনা । কবির কাকা অতুলান্ত দাশের মেয়ে । কবির জায়া লাবণ্য দাশ । তাঁকে বিয়ে করার আগে শোভনার প্রতি জীবনানন্দ অনুরক্ত ছিলেন । শোভনই কি বনলতা ? লাবণ্য দাশের সাথে তাঁর দাম্পত্যজীবন সুখের ছিলো না বলেও প্রকাশ ।

তবু কল্পনা করতে দোষ কি? বিশেষত: বাঙ্গারামের মতো স্বপ্নের দ্বীপে ভ্রমণ করে এসে । ‘বনলতা সেন’ কোনো মানবী ছিলেন না । প্রকৃতিরই রূপ । নাটোরের প্রকৃতি । বন ও লতা । নদী, মাঠ, ঘাট, নৌকা আর তাঁর গাংচিল । কবি বলেছেন , ‘পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন ।’ পাখির নীড় বন এবং লতাপাতার মধ্যেই থাকে । তাই এই তুলনা । কোনো এক দিনশেষে প্রকৃতির নিবিড় ছায়ায় তিনি শান্তি অনুভব করেছিলেন । আর কবিমানস জন্ম দিয়েছিল এই বিখ্যাত কবিতার ।